بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 1
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 18
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 7 ই জুলাই, 2016 7 এহসান, 1395 হিজরী শামসী 1 শওয়াল 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খোদা তা'লা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে ওয়াদা করিয়াছেন যে, যদি কেহ তাঁহার কেতাব ও রসূলের উপর ঈমান আনে তবে সে অধিক হেদায়তের যোগ্য হইবে। খোদা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিবেন এবং তাহাকে স্বীয় বাক্যালাপ ও সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত করিবেন। তিনি তাহাকে বড় বড় নিদর্শন দেখাইবেন। এমনকি সে এই পৃথিবীতে তাঁহাকে দেখিয়া লইবে যে, তাহার খোদা আছেন। সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করিবে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (অর্থঃ তোমরা কখনো পুণ্য অর্জন করিতে পরিবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা যাহা ভালবাস উহা হইতে খরচ কর-অনুবাদক)। কিন্তু বলা বাহুল্য, যদি আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষ এই পরিমাণ (ইবাদত) করে যে, নিজের প্রিয় ও পসন্দনীয় ধন-সম্পদ হইতে কিছু খোদা তা'লার পথে দেয় তবে ইহা কোন উচ্চ মার্গের ব্যাপার নহে। উচ্চ মার্গের ব্যাপার হইবে তখন, যখন সে অবশিষ্ট ধন-সম্পদ হইতেও হাত গুটাইয়া নেয় এবং তাহার যাহা কিছু আছে তাহা তাহার থাকে না, বরং খোদার হইয়া যায়। এমনকি সে খোদা তা'লার পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্যও প্রস্তুত হইয়া যায়। কেননা, উহাও مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (অর্থঃ আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি-অনুবাদক)-এর অন্তর্ভুক্ত। খোদা তা'লার কথা দ্বারা তিনি কেবল দেরহাম ও দিনার (অর্থাৎ টাকা কড়ি–অনুবাদক) বুঝাইতে চাহেন নাই। বরং ইহা একটি ব্যাপক অর্থবহ শব্দ। প্রত্যেকটি নিয়ামত (পুরস্কার) যাহা মানুষকে দেওয়া হইয়াছে তাহা এই শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

মোট কথা, এই জায়গায় هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (অর্থ ঃ- যাহা পথনিদের্শ মোত্তাকীদের জন্য-অনুবাদক) বলার পশ্চাতে খোদা তা'লার ইচ্ছা ইহাই যে, প্রত্যেক প্রকারের নিয়ামত, দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবন, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, শক্তি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি হইতে মানুষকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে এই ক্ষেত্রে মানুষ স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা কেবল مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (র্অথঃ- আমরা তাহাদিগকে যে রিয্ক দিয়াছি উহা হইতে খরচ করে-অনুবাদক) পর্যন্ত নিজের নিষ্ঠা প্রকাশ করিতে পারে। ইহার অধিক কিছু করা মানবীয় শক্তির আওতার বাহিরে। কিন্তু খোদা তা'লার কুরআন শরীফে ঈমান আনয়নকারীরা যদি مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ পর্যন্ত নিজেদের নিষ্ঠা প্রকাশ করে তবে هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে এই ওয়াদা আছে যে, খোদা তা'লা তাহাদিগকে এই ধরণের ইবাদতকেও উচ্চ মার্গ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। উচ্চ মার্গ এই যে, তাহাদিগকে উৎসর্গের এই শক্তি দেওয়া হইবে* যে, তাহারা মুক্ত মনে বুঝিয়া লইবে তাহাদের যাহা কিছু আছে সবই খোদার এবং কখনো কাহাকেও অনুভব করিতে দিবে না যে, এই সকল বস্তু তাহাদের ছিল যাহার দ্বারা তাহারা মানুষের সেবা করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উপকারে মাধ্যমে কখনো মানুষ কোন ব্যক্তিকে অনুভব করাইয়া দেয় যে, সে নিজের অর্থ সম্পদ অন্যকে দিয়াছে। কিন্তু ইহা একটি ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা। কেননা, যখন সে ঐ জিনিসকে নিজের জিনিস মনে করিবে তখনই সে এইরূপ অনুভব করিবে। অতএব যখন এই আয়াত অনুযায়ী খোদা তা'লার কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনয়নকারীদিগকে এই অবস্থা হইতে উন্নতি দান করেন তখন তাহারা নিজেদের সমস্ত জিনিসকে এইভাবে খোদার জিনিস মনে করিবে যে, অন্যকে অনুভব করানোর ব্যাধিও তাহাদের হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতে থাকিবে এবং মানুষের জন্য এক মাতৃসুলভ সহানুভুতি তাহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হইয়া যাইবে বরং ইহার চাইতেও অধিক এবং কোন জিনিস তাহাদের নিজের থাকিবে না; বরং সব কিছু খোদার হইয়া যাইবে। ইহা তখনই হইবে যখন তাহারা খাঁটি অন্তঃকরনে কুরআন শরীফ এবং নবী করীম (সা.) -এর উপর ঈমান আনিবে। ইহা ব্যতীত সম্ভব নহে। অতএব কতখানি পথভ্রষ্ট ঐ সকল লোক, যাহারা কুরআন শরীফ এবং রসূল করীম (সা.)-এর অনুবর্তিতা ব্যতীত কেবল শুষ্ক তওহীদকে নাজাতের কারণ সাব্যস্ত করে। বরং পর্যবেক্ষণ প্রমাণ করে যে, এইরূপ লোক উন্নতির কোন এক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানো তো দূরের কথা, তাহারা না খোদার উপর খাঁটি ঈমান রাখে এবং না জাগতিক লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা হইতে পবিত্র হইতে পারে। ইহাও সম্পূর্ণরূপে একটি ভ্রান্ত ও অন্তঃসারশূন্য ধারণা যে, মানুষ নিজে নিজেই তওহীদের পুরস্কার লাভ করিতে পারে। বরং তওহীদ খোদার কালামের মাধ্যমে পাওয়া যায়। মানুষ নিজের তরফ হইতে যাহা কিছু বুঝে তাহা শেরেক-মুক্ত নহে। অনুরূপভাবে খোদা তা'লার কেতাবসমূহের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে মানবীয় প্রচেষ্টা কেবল এই সীমা পর্যন্ত যাইতে পারে যে, সে তাকওয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার কেতাবের উপর ঈমান আনিবে এবং ধৈর্য্য সহকারে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে। ইহার অধিক কিছু করা মানুষের শক্তিতে নাই। কিন্তু খোদা তা'লা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে ওয়াদা করিয়াছেন যে, যদি কেহ তাঁহার কেতাব ও রসূলের উপর ঈমান আনে তবে সে অধিক হেদায়তের যোগ্য হইবে। খোদা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিবেন এবং তাহাকে স্বীয় বাক্যালাপ ও সম্বোধন দ্বারা সম্মানিত করিবেন। * তিনি তাহাকে বড় বড় নিদর্শন দেখাইবেন। এমনকি সে এই পৃথিবীতে তাঁহাকে দেখিয়া লইবে যে, তাহার খোদা আছেন। সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করিবে। খোদার কালাম বলে, যদি তুমি আমার উপর পরিপূর্ণ ঈমান আন তবে আমি তোমার উপরও অবতীর্ণ হইব। ইহার ভিত্তিতেই হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রা.) বলেন; আমি এইরূপ নিষ্ঠা, ভালবাসা ও উদ্দীপনার সহিত কালাম পড়িয়াছি যে, তাহা ইলহামী রঙে আমার মুখেও জারি হইয়া গেল। কিন্তু আফসোস! খোদার বাক্যালাপ কি জিনিস এবং কোন অবস্থায় বলা যাইবে, খোদা কোন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করেন তাহা মানুষ বোঝে না। বরং অধিকাংশ নির্বোধ লোক শয়তানী কথাকেও খোদার কালাম মনে করিতে আরম্ভ করে। তাহারা শয়তান ও রহমানী ইলহামের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে না। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে রহমানী ইলহাম ও ওহীর জন্য প্রথম শর্ত এই যে, মানুষ কেবল খোদার হইয়া যাইবে এবং শয়তানের কোন অংশ তাহার মধ্যে থাকিবে না। কেননা, যেখানে মৃতদেহ থাকিবে সেখানে নিশ্চয় কুকুরও ভীড় জমাইবে। এই জন্যই খোদা তা'লা বলেন, هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ (অর্থঃ আমি তোমাদিগকে

এরপর দুইয়ের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- এর ডেনমার্ক যাত্রা, মে ২০১৬

পার্লামেন্টের সদস্য এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাতঃ

হুযুর আনোয়ার (আই.) হোটেলে আসার পর কনফারেন্স রুমে আসেন এবং অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করেন ।

একজন সদস্যা নিবেদন করেন যে, প্রথমতঃ আমি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট দোয়ার আবেদন করতে চাই এবং নিবেদন করতে চাই যে, ডেনমার্কের মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায় । এরা প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অনবিহিত । আমি চাই আপনি ভিডিও-র মাধ্যমে তাদেরকে বার্তা দিন ।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইসলামের অর্থ হল শান্তি । যারা শান্তির বিরুদ্ধে তারা ইসলামের মান্যকারী নয় । যারা উগ্রবাদী তাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই । তারা ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করছে । জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে ইসলামের যে প্রকৃত শিক্ষা পৌঁছে দিয়েছেন তিনি তা কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর কাছ থেকেই শিখেছেন । এটিই আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা এবং আমি এই ইসলামকেই জানি যার মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ভালবাসা রয়েছে ।

পার্লামেন্টের সদস্য জিজ্ঞেস করেন যে, কেউ কেউ বলে ইসলামে ধর্মত্যাগের জন্য শাস্তি নির্ধারিত আছে । হুযুর বলেন, এমনটি না । কুরান করীমে আছে, لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই । কোন ধর্ম গ্রহণ করা এবং ত্যাগ করার বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে । কুরআন করীমে ধর্মত্যাগের কারণে কোন শাস্তি নেই । ধর্ম পরিবর্তনকারীদেরকে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী । ইসলাম হল শান্তি, নিরাপত্তা, পরমত সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের ধর্ম । ইসলাম হল প্রেম ও ভালবাসার ধর্ম ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমার নিকট মানবীয় মুল্যবোধ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের উপর মানবীয় মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত । জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করা উচিত এবং প্রত্যেকের অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত ।

এই সদস্যা বলেন, আপনার বার্তা অতি সুন্দর । এই বাণীকে আমি গোটা পৃথিবীতে প্রচার করতে চাই । আমার জানা ছিল যে, প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ এমনটিই হবে যেমনটি হুযুর বলেছেন ।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের বাণী হল " ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কাহারো পরে ।" এটি ইসলামী শিক্ষা সম্মত ।

আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন , حب الوطن من الايمان অর্থাৎ দেশের প্রতি ভালবাসা আমাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । আহমদীরা যেখানেই থাকুক না কেন প্রত্যেকে নিজেদের দেশকে ভালবাসে । এখানে ডেনমার্কে যখন কোন আহমদী নাগরিকত্ব লাভ করে তখন সে যথারীতি এই দেশের নাগরিক হয়ে যায় । তখন তার উপর নিজের দেশের সেবা এবং দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য কাজ করার দায়িত্ব বর্তায় । এর জন্য তাকে নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে হয় না । বরং নিজের ধর্মে অটল থেকে নিজের দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে থাকে । বস্তুতপক্ষে এটিই সমন্বয় সাধন করা ।

একজন সদস্য প্রশ্ন করেন যে, আপনারা কি অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন । এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি অপর পক্ষ এই প্রস্তাবে সম্মত হয় তবে আমি প্রস্তুত আছি । আপনি তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী , আপনি এর ব্যবস্থা করতে পারেন । কিন্তু তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সম্মত হবে না । তারা বলে যে, আমরা আহমদীরা মুসলমান নই । আমরা ইসলাম ত্যাগ করেছি ।

জিহাদ প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, জিহাদের অর্থ হল পরিশ্রম ও চেষ্টা করা । এবং ইসলামের প্রকৃত এবং শান্তিপূর্ণ শিক্ষা পৌঁছানো এবং প্রেম-প্রীতির শিক্ষা দেওয়াই জিহাদ । এই যুগে তরবারীর যুদ্ধ রহিত হয়েছে । এই যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে কেউ তরবারী গ্রহণ করছে না । কেউ অস্ত্র নিয়ে ইসলামের উপর আক্রমণ করছে না । বর্তমান যুগে কলমের জিহাদ আছে । ইসলামের উপর সংবাদ মাধ্যম এবং লেখনী প্রকাশের মাধ্যমে আক্রমণ হচ্ছে । এর উত্তরও সেই ভঙ্গিতেই দেওয়া বাঞ্ছনীয় ।

অভ্যার্থনা অনুষ্ঠানঃ

এই মিটিং ৬টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত চলতে থাকে । এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.) হলঘরে আসেন । হুযুরের আগমণের পূর্বে সকল অতিথিরা নিজেদের আসন গ্রহণ করেছিল ।

আমীর ও জেলা ইনচার্য ডেনমার্ক অভ্যার্থনাসূচক ভাষণ পাঠ করে শোনান । এর পর অতিথিরা নিজেদের ভাষণ উপস্থাপন করেন ।

* সর্ব প্রথম সম্মানীয় Holger Schou Rasmuseen সাহেব যিনি লল্যান্ড-এর মেয়র, ভাষণ উপস্থাপন করে বলেন: আজ এই অনুষ্ঠানে আমি আমন্ত্রিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । লল্যান্ড মিউনিসিপাল-এর মেয়র হিসেবে হুযুর আনোয়ার (আই.) কে ডেনমার্কে স্বাগত জানানো আমার কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্য ও সম্মানের বিষয় । এমন ধর্মীয় বার্তাকে ব্যাপকহাকের প্রচার করা উচিত যা শান্তি, সহিষ্ণুতা ও হিত সাধনের কথা বলে । আর বিশেষ করে বর্তমানের ভীতি এবং অবিশ্বাসের পরিবেশে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় । আমরা সকলেই এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হই । আমাদের সকলের দায়িত্ব হল এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা । আমি খুবই আনন্দিত যে, ডেনমার্কের সবথেকে পুরোনো মুসলিম জামাত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে । আপনারা এখানে অন্যন্য ধর্মের প্রতিনিধিবর্গের সাথে একত্রে বসে আছেন, যাদের মধ্যে খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ এবং মুসলমান আছেন । এই অঞ্চলটি ধর্মের বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে । বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক দন্দ্ব-বিবাদ নেই । আপনাদের খলীফার প্রেম-সম্প্রীতির বার্তা প্রচার করার বিষয়টিও এর প্রতিফলন । আমরা আনন্দিত যে, আপনারা নাকসিকোতের মসজিদের জন্য জায়গা পেয়েছেন । আমরা গর্বিত যে আপনারা আমাদের সমাজের অংশ । আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ।

* এর পর একজন পার্লামেন্টের সদস্যা মাননীয়া উল্লা স্যান্ডবেক যিনি অল্টারনেটিভ পর্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, তিনি বলেন:আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ । আমি এখানে এসে খুবই আনন্দিত হয়েছি । আমি এই অনুষ্ঠানের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি । আজ পৃথিবী অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন । আমরা জানিনা যে, আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বজায় থাকবে কি না কেননা এটি চতুর্দিক থেকে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে । এটা অত্যন্ত আবশ্যক যে, ধর্মীয় পথ-প্রদর্শকগণ শান্তি ও ঐক্যের বিষয়ে বলবেন, এবং বোঝাবেন যে, আমরা সকলেই একই মানব সম্প্রদায়ভুক্ত । আমরা লক্ষ্য করছি যে, আজকাল পোপও প্রথা ভেঙ্গে ঐক্য ও ভালবাসার কথা বলছে । আমি আনন্দিত যে, হুযুর আনোয়ার (আই.)ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে শান্তির কথা বলবেন । আমি আনন্দিত যে, ইসলামের মধ্য থেকেও কোন কণ্ঠ উত্থিত হয়েছে যা ভালবাসা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা বলে । তাই আজকের সন্ধ্যায় আমি খলীফার কথা শুনতে এসেছি যাতে আমি এই বাণী আরও ছড়িয়ে দিতে পারি এবং পৃথিবীতে শান্তির প্রসারে নিজের নগন্য ভুমিকা রাখতে পারি । আমি হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তিনি এখানে এসেছেন । (ক্রমশঃ)

একের পাতার পর....

অবহিত করিব যে, কাহার উপর শয়তানেরা নাযেল হয়? তাহারা প্রত্যেক মিথ্যবাদী, পাপাচারীর উপর নাযেল হয়- অনুবাদক) । কিন্তু যাহার মধ্যে শয়তানের অংশ থাকে না এবং যে হীন জীবন হইতে এইরপ দূরে সরিয়াছে যেন মরিয়া গিয়াছে, সত্য-নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিণত হইয়াছে এবং খোদার দিকে আসিয়া গিয়াছে তাহাকে শয়তান আক্রমণ করিতে পারে না। যেমন আল্লাহ্ বলেন, اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (অর্থঃ নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য হইবে না-অনুবাদক) যাহারা শয়তানের এবং যাহাদের মধ্যে শয়তানের বৈশিষ্ট্য আছে তাহাদের দিকেই শয়তান দৌড়ায়। কেননা তাহারা শয়তানের শিকার।

* টীকাঃ ইহার কারণ এই যে, মানবীয় দুর্বলতার দরুন মানুষের প্রকৃতিতে একটি কৃপণতাও আছে যে, যদি তাহার নিকট একটি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে তবুও তাহার মধ্যে কৃপণতার একটি অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের সমস্ত সম্পদ যে হাত ছাড়া করিতে চাহে না। কিন্তু যখন هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতের দরুন তাহার মধ্যে একটি অযাচিত শক্তি আসিয়া পড়ে তখন তাহার হৃদয় এইভাবে খুলিয়া যায় যে, তাহার সকল কৃপণতা ও আত্মার কামনা-বাসনা দূর হইয়া যায়। তখন সকল সম্পদের চাইতে খোদার সন্তুষ্টি তাহার নিকট অধিক প্রিয় মনে হয় এবং সে পৃথিবীতে সম্পদের নশ্বর ভাণ্ডার জমা করিতে চাহে না। বরং সে আকাশে স্বীয় সম্পদ জমা করে।

** টীকাঃ প্রকৃতপক্ষে ঐ রং গ্রহণ করা এবং জ্যেতিঃ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়াই পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা। دَخَلْتُ النَّارَ حَتّٰى صِرْتُ نَارًا (অর্থঃ আমি আগুনে প্রবেশ করিলাম। এমনকি নিজেই আগুনে পরিণত হইলাম- অনুবাদক)

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৪০-১৪২)

জুমআর খুতবা

ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তিন চার দিনের মধ্যে পবিত্র রমযান মাস আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এই দিনগুলি দীর্ঘ হওয়ার কারণে গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সমূহে রোযা বড় কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রত্যেক সুস্থ্য এবং সাবালক ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। অবশ্য কোন কোন পরিস্থিতিতে রোযা রাখার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ন্যায় বিচারক এবং মীমাংসাকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাঁর দায়িত্ব ছিল ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি বিষয়ের মীমাংসা করা এবং তিনি তা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল সকল বিষয়ের সকল সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করা আর তিনি তা করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়াদির সমাধান এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের তাঁর প্রতি দেখা উচিত।

কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী ও নির্দেশের আলেকে রমাযানুল মুবারকের সূচনা, সেহরী, ইফতারী , মুসাফির ও অসুস্থদের রোযা, রমযানের ফিদিয়া প্রদান করা, রোযা রাখার বয়স এবং নামাযে তারাবীহ ও প্রমূখ বিষয়ে আলোচনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ৩রা জুন, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৩ এহসান,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তিন চার দিনের মধ্যে পবিত্র রমযান মাস আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এই দিনগুলি দীর্ঘ হওয়ার কারণে গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সমূহে রোযা বড় কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রত্যেক সুস্থ্য এবং সাবালক ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা আবশ্যক। অবশ্য কোন কোন পরিস্থিতিতে রোযা রাখার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশ সমূহে কিছু শ্রমিকদের রোযা না রাখার ছাড় রয়েছে বা যদি রোযা রাখার পরিস্থিতি না থাকে তাহলে আরো এমন কিছু শর্তে রোযা না রাখার ছাড় রয়েছে। অনুরূপভাবে আজকাল কিছু দেশে যেখানে দিন ২২/২৩ ঘন্টা দীর্ঘ বা দেড় দুই ঘন্টার রাত, তা-ও পুরো রাত নয় বরং আলো বিরাজ করে বা ঊষা ও গোধূলীর মত সময় হয়ে থাকে। সেখানকার জামাতগুলোকে বলা হয়েছে তারা যেন সময়ের একটা অনুমান করে সেহরী ও ইফতারের সময় নির্ধারণ করে নেয়। অধিকাংশ স্থানে পার্শবর্তী দেশের সময়ের ওপর নির্ভর করে বা তাদের সময়ের ধারণা অনুযায়ী আজকাল ১৮/১৯ ঘন্টার রোযাই হবে। যদি এসব দেশে এমনটি না করা হয় তাহলে সেহরী এবং ইফতারের কোন সময়ই থাকবে না। তাহাজ্জুদও পড়া সম্ভব হবে না। আর এশা এবং ফজরের সময়ও নির্ধারণ করা যাবে না। যাহোক এসব অঞ্চলে যে জামাতগুলো রয়েছে সেই অনুসারে তারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত করবেন যে, তারা কিভাবে সময় নির্ধারণ করবেন।

রোযা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি, আর তা পূর্ণ করাও আবশ্যক। রোযা সম্পর্কে কিছু ছোট ছোট প্রশ্নেরও অবতারণা হয়। যেমন, সেহরীর ও ইফতারের সময় এবং অসুস্থতা সম্পর্কে, অনুরূপভাবে সফর সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। খোদার অপার কৃপায় প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকা এবং ভিন্ন ধর্ম হতেও তারা এসে থাকে। মুসলমানদের বিভিন্ন ফিরকায় কিছু বিধি-নিষেধ সম্পর্কে বিভিন্ন ফিকাহ্গত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এই সকল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন তারা জামাতে প্রবেশ করে তখন কিছু বিয়য়ে তারা অসাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তারা এরকিছু ব্যাখ্যা চায়। অনেকেই বিস্তারিত আলোচনা চায়, আবার অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করে। অনুরূপভাবে ভিন্ন ধর্ম থেকে যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করে তারা কিছু বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবিহিত থাকে আর তারা নতুনভাবে সব কিছু শিখে। তাই তাদের জন্য ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে ন্যায় বিচারক এবং মীমাংসাকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাঁর দায়িত্ব ছিল ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেকটি বিষয়ের মীমাংসা করা এবং তিনি তা করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁর দায়িত্ব ছিল সকল বিষয়ের সকল সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করা আর তিনি তা করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয়াদির সমাধান এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের তাঁর প্রতি দেখা উচিত।

রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়, যেভাবে আমি বলেছি, সেই অনুসারে কিছু প্রশ্ন বা এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থান কি ছিল বা তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর ঘোষণা বা নিদান কি ছিল, এখন আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, এই যুগে শরীয়তের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে তাঁর (আ.) নির্দেশ এবং দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের জন্য সেই বিষয়ের শরীয়ত সম্মত সমাধান বা সিদ্ধান্ত।

এখানে প্রথম কথা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষা অনুশীলনের ভিত্তি হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রেখে রোযা সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাণীকে সামনে রাখুন যে, "আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৫)

কিছু মানুষ প্রশ্ন করে, যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ রমযান সম্পর্কে ছোট বাচ্চারা প্রশ্ন করে যে, আমরা রমযান এবং ঈদ ইত্যাদি অ-আহমদী মুসলমানদের পৃথক সময়ে কেন পড়ি বা আরম্ভ করি। প্রথমত রমযানে এবং ঈদের সময়ে তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য থাকতেই হবে এমনটি আবশ্যক নয়, আর না আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেও কোন মতভেদ করি। এমন বছরও এসেছে এবং এসে থাকে যখন আমাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের রোযা এবং ঈদ একই দিনে হয়ে থাকে। পাকিস্তানে এবং মুসলমান বিশ্বে যেখানে সরকারের পক্ষ থেকে চন্দ্রোদয় নিরুপণকারী (হিলাল) কমিটি গঠিত হয়েছে, তারা যখন ঘোষণা করে যে, চাঁদ দেখা গেছে আর সাক্ষীও বিদ্যমান থাকে, তখন আমরা আহমদী মুসলমানরাও সেই অনুসারেই আমাদের রোযা রাখি আর সে অনুসারেই আমাদের রোযা সমাপ্ত হয়, আর আমাদের ঈদও একইভাবে উদযাপিত হয় ।

ইউরোপিয়ান দেশে বা পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে সরকারের পক্ষ থেকে এমন চাঁদ দেখা কমিটির ব্যবস্থা নেই আর এর ঘোষণাও করা হয় না। তাই আমরা চাঁদ দেখতে পাওয়ার স্পষ্ট সম্ভাবনাকে সামনে রেখে রোযা আরম্ভ করি এবং ঈদ করি। হ্যাঁ যদি আমাদের ধারণা ভুল হয় আর চাঁদ পূর্বেই দেখা যায় তাহলে বিবেকসম্পন্ন সাবালক ও মু'মিনদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদানের সাপেক্ষে পূর্বেই রোযা আরম্ভ করা যেতে পারে। যে চার্ট তৈরী করা হয় সে অনুসারেই রোযা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক নয়, কিন্তু চাঁদ স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা অবশ্যই অ-আহমদী মুসলমানদের ঘোষণা অনুসারে চাঁদ না দেখে রোযা আরম্ভ করব আর ঈদ করব- এমনটি করা ভুল । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)- এই বিষয়টি তাঁর গ্রন্থ 'সুরমা চশমায়ে আরীয়া'-তে উল্লেখ করেছেন, হিসাব-পর্যালোচনা বা অনুমানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নি। এটিও বিজ্ঞানলব্ধ একটি জ্ঞান, কিন্তু দেখাকে তিনি (আ.) প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় বিধিকে সহজসাধ্য করার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে সুস্পষ্ট এবং সোজা পথ সম্পর্কে অবহিত করেছেন,অনর্থক জটিল বিষয়ে তাকে ঠেলে দেন নি। যেমন, রোযা রাখা সংক্রান্ত এই নির্দেশ দেন নি যে, যতক্ষণ তোমরা জ্যোতিষীদের হিসাব অনুসারে এটি নির্ধারণ করতে না পার যে, চাঁদ ২৯ না ৩০ দিনের, ততক্ষণ দেখার বা রো'ইয়াতের বিষয়টিকে আদৌ বিশ্বাস করবে না। (অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে হিসাবের যে নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে নিয়ম নির্ধারণ করেছেন সেই সকল নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক নয় আর তাদের হিসাব যদি এটি বলে যে, চাঁদ ২৯ বা ৩০ এর হয়েছে সেই অনুসারে রোযা রাখতে হবে এবং চাঁদ দেখার চেষ্টা করা যাবে না বা চাঁদ দেখার বিষয়টি আদৌ বিশ্বাস করবে না, এমন নীতি ভ্রান্ত।) তিনি বলেন, এমন যেন না হয় যে, দেখার বিষয়টিকে তোমরা আদৌ গুরুত্ব দেবে না আর চোখ বন্ধ করে রাখবে, এটি ভুল। কেননা, জ্যোতিষীদের সূক্ষ্ম গবেষণা কর্মকে জনসাধারণের গলার হার বানিয়ে বসা এটি অনর্থক নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর।" (শুধু এই কথার ওপর আমল করা যে, বিজ্ঞানের অনুমান এটি বলছে, আমরা এর বাইরে আর কোন কিছু করবো না, এটি ঠিক নয়।) তিনি বলেন, "এমন হিসাবের ক্ষেত্রে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েই থাকে। তাই জ্যোতির্বিদদের মুখাপেক্ষী না থাকাই জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এটিই সহজ পথ।" (অর্থাৎ যারা নক্ষত্র এবং তাদের গতিবিধির জ্ঞান রাখে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে যেন বসে না থাকে) আর চাঁদ উদিত হওয়ার দিনটির জন্য নিজেদের চাঁদ দেখার ওপর যেন নির্ভর করে। আর এতটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশ অতিক্রম না করে। (চাঁদ দেখা আবশ্যক, কিন্তু দেখার চেষ্টা করার পরও যদি দেখা না যায় তাহলে জ্যোতির্বিদদের হিসাবের ওপরও নির্ভর করা যায়। আর এই কথার ওপরও দৃষ্টি রাখা উচিত যে, দিনের সংখ্যা যেন ত্রিশের অধিক না হয়।) তিনি বলেন, এটিও স্মরণ রাখা উচিত যে, যুক্তিগত দিক থেকে চাঁদ দেখা যাওয়া গাণিতিক হিসাবের ওপর প্রাধান্য পায়।" (বিবেকও এটিই বলে যে, চর্মচোখে দেখার বিষয়টির গাণিতিক হিসাবের ওপর অবশ্যই প্রাধান্য রয়েছে।) ইউরোপের দার্শনিকেরাও দেখাকে বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করার সুবাদে দৃষ্টি শক্তির সমর্থনে বিভিন্ন প্রকার অনুবীক্ষণ এবং দরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেছে।"

(সুরমা চাশমে আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড , পৃষ্ঠা-১৯২-১৯৩)

যখন ইউরোপের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান শ্রেণী এবং বিজ্ঞানীরা এই কথাকে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান করেছে যে, চর্মচোক্ষে দেখা বেশি গ্রহণযোগ্য তখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা দুরবীক্ষণ যন্ত্র বানিয়েছে যার মাধ্যমে তারা গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে।

আমি যেভাবে বলেছি যে, অনেক সময় হিসাবে ভুলও হতে পারে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, যদি ভুল হয়ে যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি প্রমাণিত হয় যে, চাঁদ একদিন পূর্বেই দেখা গেছে, এমন ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত? কেননা, এর অর্থ দাঁড়াবে একটি রোযা পরিত্যক্ত হল, আমরা একদিন পরে রমযান আরম্ভ করলাম। যদিও চ চাঁদ পূর্বেই দেখা গেছে আর প্রমাণও হয়েছে যে, চাঁদ পূর্বেই উদিত হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে কি করণীয়? এই প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হয়। শিয়ালকোট থেকে এক বন্ধু জিজ্ঞেস করেন যে, এখানে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায় নি বরং বুধবারে দেখা গিয়েছে অথচ বুধবারে রমযান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, সেই এলাকায় সাধারণভাবে এটিই হয়েছে আর এই কারণে বৃহস্পতিবারে প্রথম রোযা রাখা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, রোযা বুধবারে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমাদের এখানে প্রথম রোযা রাখা হয়েছে বৃহস্পতিবারে। এখন কি করা উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর পরিবর্তে রমযানের পর একটি রোযা রাখা উচিত।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৭)

যে রোযা রয়ে গেছে তা রমযানের পর রাখ।

অনুরূপভাবে সেহরী খাওয়ার বিষয় রয়েছে। সেহরী খেয়ে রোযা রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন, রোযার সময় সেহরী খেয়ো কেননা সেহরী খেয়ে রোযা রাখাতে কল্যাণ নিহিত আছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সাওম)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও এই রীতি অনুসরণ করতেন আর জামাতের সদস্যদের এবং বন্ধুদেরও এই নসীহত করতেন। অনুরূপভাবে কাদিয়ানে যে সমস্ত অতিথিরা আসতেন তাদের জন্য রীতিমত সেহরীর ব্যবস্থা থাকতো বরং খুব ভালোভাবে ব্যবস্থা করা হতো।

এই সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, কপুরথলার মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব আমাকে লিখিত জানিয়েছেন যে, আমি কাদিয়ানে মসজিদে মুবারক সন্নিবেশিত কক্ষে থাকতাম। একবার আমি সেহরী খাচ্ছিলাম এমতাবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন, তিনি আমাকে সেহরী খেতে দেখে বলেন, "আপনি কি সেহরীর সময় ডাল রুটিই খান?" আর তখনই ব্যবস্থাপককে ডাকেন এবং বলেন, "সেহরীর সময় বন্ধুদের কি এমন খাবারই দেন? আমাদের যত বন্ধু আছে তারা সফরে নয় (বরং এখানে অবস্থান করছেন আর রোযা রাখছেন) তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করুন যে, তাদের কি কি খাওয়ার অভ্যাস আছে, সেহরীর সময় তারা কি খাওয়া পছন্দ করেন এবং সেই খাবার তাদের জন্য প্রস্তুত করা হোক। এরপর ব্যবস্থাপক আমার জন্য আরো খাবার নিয়ে আসেন কিন্তু আমি খাওয়া শেষ করে ফেলেছিলাম আর আযানও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হুযূর বলেন, খেয়ে নাও, আযান সময়ের পূর্বেই দেওয়া হয়েছে, এই ব্যাপারে চিন্তা করো না।"

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-১২৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে নামাযে তাহাজ্জুদ পড়া এবং সেহরী খাওয়া সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ১৮৯৫ সনে পুরো রমযান মাস কাদিয়ানে অতিবাহিত করার আমার সৌভাগ্য হয়। আমি পুরো মাস হযরত সাহেবের পেছনে নামাযে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ তারাবী পড়েছি। তাঁর রীতি ছিল তিনি রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়ে ফেলতেন আর দুই দুই রাকাত করে রাতের শেষ অংশে আট রাকাত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আর এই নামাযে তিনি সবসময় প্রথম রাকাতে আয়তুল কুরসী তিলাওয়াত করতেন অর্থাৎ اَللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ থেকে وَھُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْم পর্যন্ত পড়তেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। আর রুকু এবং সিজদায় یَاحَیُّ یَاقَیُّوْمُ بِرَحْمَتِکَ اَسْتَغِیْثُ প্রায়শঃ পড়তেন, আর এমনভাবে পড়তেন যে, তাঁর আওয়াজ আমি শুনতে পেতাম। এছাড়া সেহরী সবসময় তিনি তাহাজ্জুদের পর খেতেন। আর সেহরী খাওয়ার ক্ষেত্রে এত বিলম্ব করতেন যে, অনেক সময় খেতে খেতে আযান হয়ে যেত। তিনি অনেক সময় আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত খাবার অব্যাহত রাখতেন।" হযরত মিঞা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, "সত্যিকার অর্থে যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব দিগন্তে ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ না পায় ততক্ষণ সেহরী খাওয়া বৈধ। আযানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, ফজরের আযানের সময়ও ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়ার পর হয়ে থাকে, তাই অনেক স্থানে মানুষ সচরাচর আযানকে সেহরীর শেষ সীমা মনে করে। কাদিয়ানে যেহেতু ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ পাওয়ার পরেই ফজরের আযান হয়ে যায় বরং হতে পারে অনেক সময় ভুল বশতঃবা অসাবধানতা বশতঃ এর পূর্বেও হয়ে যায়, তাই এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আযানের প্রতি কর্ণপাত করতেন না বরং ভোরের শুভ্রতা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত সেহরী খেতেন। সত্যিকার অর্থে শরীয়তের উদ্দেশ্য এটি নয় যে, হিসাবের দৃষ্টিকোণ থেকে যখন ভোরের শুভ্রতার সূচনা হয় তখনই খাবার ছেড়ে দেওয়া উচিত, বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ভোরের শুভ্রতা যখন প্রকাশ পায় তখন খাবার ছেড়ে দেওয়া উচিত। 'তাবায়্যুন' শব্দ এবিষয়টিকেই স্পষ্ট করছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের আযান শুনে সেহরী খাওয়া বন্ধ কোরো না বরং ইবনে মাক্তুম-এর আযান পর্যন্ত আহার গ্রহণ অব্যাহত রাখ, ইবনে মাক্দূম যেহেতু অন্ধ ছিলেন তাই সকাল হয়ে গেছে যতক্ষণ হৈচৈ আরম্ভ না হতো তিনি আযান দিতেন না।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ,পৃষ্ঠা-২৯৫-২৯৬)

গত বছর আমি এক বন্ধুকে বলেছিলাম যে, আপনি দীর্ঘক্ষণ সেহরী খেতে থাকেন, এই কথা শুনে তিনি এরপর পুনরায় রোযা রাখেন। আমার কথা শুনেই হয়তো পরে আবার রোযা রেখেছেন। কিন্তু তিনি যদি উল্লেখিত সময়কে অতিক্রান্ত না করে থাকেন তাহলে ঠিক আছে। এখনও সবাই এটি যাচাই করতে পারে। এখানে তো আযান হয় না, কিন্তু ভোরের শুভ্রতা দেখা আবশ্যক। যখন শুভ্র রেখা প্রকাশিত হয় সেই সময় পর্যন্ত সেহরী খাওয়া যেতে পারে।

সেহরীর সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তা সংক্রান্ত আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে, ডাক্তার খলীফা রশীদ উদ্দিন মরহুম সাহেবের স্ত্রী কাদিয়ানের লাজনা ইমাইল্লাহ্র মারফত লিখিত জানিয়েছেন যে, এটি ১৯০৩ সনের কথা। আমি এবং ডাক্তার সাহেব মরহুম রাঢ়কী থেকে এসেছি,

চারদিন ছুটি ছিল। হুযূর জিজ্ঞেস করেন যে, সফরে রোযা রাখেননি তো, আমরা বললাম, না। হুযূর গোলাপি কক্ষে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন যে, আমরা রোযা রাখব। তিনি (আ.) বলেন, ভালো কথা। এরপর বলেন যে, আপনারা সফরে আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, কয়েকদিন এখানে অবস্থান করব তাই রোযা রাখার ইচ্ছা হচ্ছে। তিনি (আ.) বলেন, ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে কাশ্মীরি পরটা খাওয়াবো। আমরা ভাবছিলাম যে, আল্লাহ্ই জানে, কাশ্মীরি পরটা কেমন হয়। যখন সেহরীর সময় হল, আর আমরা তাহাজ্জুদ ও নফল শেষ করলাম, এরপর খাবার নিয়ে আসা হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং ঘরের নিচের তলায় অবস্থিত সেই গোলাপি কক্ষে আসেন । হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব উপরের তিন তলায় থাকতেন। তাঁর প্রথম স্ত্রী করিম বিবি সাহেবা যাকে মৌলভীয়ানী বলা হতো, কাশ্মীরি ছিলেন, তিনি ভালো পরটা বানাতে পারতেন। হুযূর আমাদের জন্য তার দ্বারা পরটা বানিয়েছিলেন। উপর থেকে গরম গরম পরটা আসতো আর হুযূর (আ.) নিজেই আমাদের জন্য তা নিয়ে আসতেন এবং বলতেন যে, ভালো করে পেট ভরে খাও। আমার লজ্জা হচ্ছিল, ডাক্তার সাহেবও লজ্জা পাচ্ছিলেন, কিন্তু আমাদের ওপর হুযূরের স্নেহ এবং বদান্যতার যে প্রভাব ছিল তার ফলে আমাদের রন্ধ্র রন্ধ্র আনন্দের স্পন্দনে শিহরিত হচ্ছিল। ততক্ষণে আযান হয়ে যায়। হুযূর (আ.) আমাদের বলেন যে, আরো খাও, এখনো অনেক সময় আছে। তিনি বলেন, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৮)। মানুষ এটির উপর অনুশীলন করে না। আপনারা খান, এখনো অনেক সময় আছে। মুয়ায্যিন সময়ের পূর্বেই আযান দিয়ে দিয়েছে। (তিনি বলেন) আমরা যতক্ষণ খাচ্ছিলাম হুযূর দাঁড়িয়েছিলেন এবং পায়চারি করছিলেন। যদিও ডাক্তার সাহেব বলেন যে, হুযূর! বসুন, আমি খাদেমার কাছ থেকে পরটা নিয়ে নিব বা আমার স্ত্রী নিয়ে নিবে। কিন্তু হুযূর মানেন নি আর অতিথি সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এই খাবারে তরকারীও ছিল এবং দুধ, সিমাই ইত্যাদিও ছিল।

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৫ম ভাগ,পৃষ্ঠা-২০২-২০৩)

নিঃসন্দেহে ভালো খাবার খান কিন্তু এই ক্ষেত্রেও মধ্যম পন্থা বা ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। রোযা রেখে এই সচেতনতাও থাকা উচিত যে, আমরা রোযা রেখেছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ' يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৬)। তোমরা ঈমান আনবে আর কষ্টের মাঝে পড়ে থাকবে এমনটি আমাদের জন্য সহ্য করা সম্ভব নয়। (আল্লাহ তা'লা বলেন) রোযা এই কারণে আবশ্যক করেছি যাতে তোমাদের কষ্ট এবং অসচ্ছলতা দূরীভূত হয়। এটি এমন একটি কথা যা মু'মিনকে মু'মিন বানায়। (এটি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, তিনি তোমাদের জন্য সাচ্ছন্দ বা সহজসাধ্যতা চান, কষ্ট নয়। এর ব্যাখ্যা কি?) এটি এমন একটি গুণ বা যোগ্যতা যা মু'মিনকে মু'মিন বানায়, আর তা হলো রোযায় ক্ষুধার্ত থাকা বা ধর্মের খাতিরে কুরবানী করা মানুষের জন্য ক্ষতির কোন কারণ নয় বরং এটি সম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর বিষয়। যে মনে করে যে, রমযানে মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে সে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, এ জন্য আমি রমযান নির্ধারণ করেছি যেন তোমরা অন্ন গ্রহণ করতে পার। অতএব বোঝা গেল রুটি বা খাবার হলো সেটিই যা আল্লাহ্ তা'লা খাওয়ান। আর এর সাথেই প্রকৃত জীবনের সম্পর্ক। এছাড়া যে খাবার রয়েছে তা রুটি নয়, বরং তা পাথর, যা তার আহারকারীর জন্য ধ্বংসের কারণ। মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো যে গ্রাসই তার মুখে যায় তার দেখা উচিত যে, তা কার জন্য, যদি আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটিই খাবার, আর যদি প্রবৃত্তির জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটি খাবার নয়।"

সুতরাং সেহরী যদি খোদার নির্দেশে খাওয়া হয় আর ভালোও খাওয়া হয় তাহলে তা খোদার সন্তুষ্টির জন্য। আর মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, এতে কল্যাণ নিহিত থাকবে। আর যদি শুধু উদরপূর্তি করা উদ্দেশ্য হয় আর ভালো খাবার খাওয়া উদ্দেশ্য হয়, স্বাদ পাওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা প্রবৃত্তির জন্য। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর ব্যাখ্যা করে বলেন "সেটিই প্রকৃত পোষাক যা খোদার জন্য পরিধান করা হয়। প্রবৃত্তির জন্য পোষাক পরিহিত ব্যক্তি নগ্ন। দেখ কত সূক্ষ্মভাবে বলা হয়েছে, যতদিন আল্লাহ্র জন্য কষ্ট সহ্য না করবে ততদিন তোমরা সুযোগ পেতে পার না। এর মাধ্যমে সেই সকল লোকদের ধারণারও খণ্ডন হয় যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে রমযানকে স্থূলতার কারণে পরিণত করে। (কিছু মানুষ এমন আছে যাদের ওজন রমযানে কম হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পায়) হুযূর (আ.) বলতেন, অনেকের জন্য রমযান তেমনই যেভাবে ঘোড়ার জন্য 'খুদ' হয়ে থাকে (গম এবং যব একত্রিত করে তৈরী এক প্রকারের উন্নত মানের ঘোড়ার খাদ্য) এমন লোকেরা রমযানের দিনগুলিতে ঘি, মিষ্টি এবং তৈলাক্ত খাবার খেয়ে সেভাবে মোটা হয় যেভাবে 'খুদ' খেয়ে ঘোড়া মোটা হয়ে থাকে। এগুলো রমযানের বরকতকে হ্রাস করে।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৫-৩৯৬)

এখন দেখ একদিকে নির্দেশ রয়েছে সেহরী খাও এতে বরকত বা কল্যাণ রয়েছে, ইফতারী খাও তাতেও বরকত নিহিত আছে, পক্ষান্তরে যদি শুধু আহার করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা সেই বরকত এবং কল্যাণকে হ্রাস করে। তাই ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। অতএব ভালো খাবার খাও কিন্তু ভারসাম্য বজায় রেখে খাও।

সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, "আমার ভালোভাবে মনে পড়ে, খুব সম্ভব মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, যিনি আজকাল একজন নেত্রীস্থানীয় লাহোরী, একবার বাইরে থেকে আসেন। আসরের সময় ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জোর দেন যে, রোযা ভেঙ্গে ফেল, তিনি বলেন, সফরে রোযা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে একবার অসুস্থতার প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো ধর্ম যে ছাড় দিয়েছে সেগুলো কাজে লাগানো উচিত। ধর্ম কাঠিন্য নয় বরং সাচ্ছন্দ ও সহজসাধ্যতা শেখায়। অনেকে বলে যে, মুসাফির ও অসুস্থরা যদি রোযা রাখতে পারে তাহলে রাখা উচিত। আমি এটিকে সঠিক মনে করি না। এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি শুনিয়েছেন যে, সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা তিনি বৈধ মনে করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে এমন অবস্থায় রাখা রোযা পরবর্তীতে অন্য কোন সময় রাখা বাঞ্ছনীয়। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, হ্যাঁ আমাদেরও একই বিশ্বাস ।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭)

একবার বক্তৃতা করার সময় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, আর তা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা সম্পর্কে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, "রোগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্দেশ লঙ্ঘনের ফতোয়া বর্তাবে" । হযরত মুসলেহ (রা.) কে তিনি বলেন,আল-ফযলে তাঁর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ছাপা হয়েছে যে, আহমদী বন্ধুরা যারা জলসা সালানায় আসবেন, তারা এখানে এসে রোযা রাখতে পারবেন। (তখন জলসা সালানার সময় রমযান মাস এসে যায় আর সে দিনগুলোতেই জলসা হয়, কিন্তু যাদের রোযা রাখার ছিল তারা রোযাও রেখেছে) তিনি লিখেন, যারা রোযা রাখবে না এবং পরে রাখবে তাদের বিরুদ্ধেও কোন আপত্তি বর্তাবে না। (এই ঘোষণাও ছাপা হয়েছে) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এ সম্পর্কে প্রথমত আমি এই কথা বলতে চাই যে, আমার কোন ফতোয়া বা ঘোষণা আল ফযলে ছাপেনি। হ্যাঁ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ফতোয়া আমার বর্ণনুসারে ছেপেছে। আসল কথা হলো খিলাফতের প্রথম দিকে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম, কেননা আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি যে, তিনি মুসাফিরকে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন না। একবার আমি দেখেছি, মির্যা আইয়ূব বেগ সাহেব রমযানে এখানে আসেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন, আসরের সময় তিনি যখন আসেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন যে, রোযা ভেঙ্গে ফেলুন,সফরে রোযা রাখা অবৈধ। এটি নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনা হয়। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) চিন্তা করেন, কোথাও আবার সে হোঁচট না খেয়ে যায়। তাই তিনি ইবনে আরাবীর উক্তি উপস্থাপন করেন যে, তিনিও একই কথা বলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘটনার আমার ওপর যে প্রভাব ছিল সেই কারণে আমি সফরে রোযা রাখতে বারণ করতাম। দৈবক্রমে একবার মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব এখানে রমযান মাস কাটানোর জন্য আসেন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যারা বাইরে থেকে আসে আপনি তাদেরকে রোযা রাখতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমার বর্ণনা অনুযায়ী এখানে এক ব্যক্তি এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, আমার এখানে অবস্থান করতে হবে, আমি এর মাঝে রোযা রাখব কি রাখব না? (পূর্বে দু'টো ঘটনা শুনানো হয়েছে যে, মুসাফিররা কাদিয়ানে এসে রোযা রাখতো) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, হ্যাঁ, আপনি রোযা রাখতে পারেন, কেননা কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় জন্মভূমির মর্যাদা রাখে। (হযরত মুসলেহ মওউদ বলেন) যদিও মৌলভী আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর

খুব ঘনিষ্ঠ ও নৈকট্য প্রাপ্ত সাহাবী ছিলেন, কিন্তু আমি শুধু তাঁর রেওয়ায়েতই গ্রহণ করি নি। এ সম্পর্কে অন্যান্য মানুষের সাক্ষ্যও গ্রহণ করার আমি অবগত হয়েছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে অবস্থানকালে রোযা রাখার অনুমতি দিতেন। অবশ্য আসা এবং যাওয়ার দিন অনুমতি দিতেন না, সেই কারণে আমার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করতে হয়। তো এবার রমযানে যখন বার্ষিক জলসা আসছিল আর প্রশ্ন উঠানো হয় যে, তাদের রোযা রাখা উচিত কি না, তখন এক ব্যক্তি বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে রমযানে যখন জলসা আসে আমরা স্বয়ং মেহমানদেরকে সেহরী খাইয়েছি। এই পরিস্থিতিতে এখানে জলসায় আগমনকারীদের রোযা রাখার যে অনুমতি দিয়েছি সেটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই একটি ফতোয়া। পূর্বের আলেমগণ সফরে রোযা রাখা বৈধ আখ্যা দিয়ে আসছিলেন, আর বর্তমান যুগের অ-আহমদী মৌলভীরা সফরকে সফরই আখ্যা দেয় না। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সফরে রোযা রাখতে বারণ করেছেন, আর তিনি নিজেই এ কথা বলেন যে, কাদিয়ানে এসে রোযা রাখা বৈধ। এখন তাঁর একটি ফতোয়া আমরা গ্রহণ করব আর দ্বিতীয়টি প্রত্যাখ্যান করব এমনটি যেন না হয়। এভাবে সেই কথাই প্রযোজ্য হবে যা এক পাঠান সম্পর্কে কথিত রয়েছে। পাঠানরা ধর্মীয় আইনশাস্ত্র বা ফিকাহ্ কঠোরভাবে মেনে চলে। এক পাঠান ছাত্র ফিকাহ পড়ে জেনেছে যে, 'হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়া-চড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। সে যখন হাদিসে মহানবী (সা.) সম্পর্কে পড়ল যে, তিনি একবার নামাযে নড়া-চড়া করেছেন তখন সে বলল, ইস! মহানবী (সা.)-এর তো তাহলে নামায নষ্ট হয়ে গেছে কেননা 'কদূরী'-তে এটি লেখা রয়েছে যে, 'হরকতে কবীরা' বা খুব বেশি নড়া-চড়া করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। মোট কথা সেই পাঠান বা কোন ব্যক্তি এই মৌলভীদের কাছে জ্ঞানার্জনকারীরা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধেই ফতোয়া প্রদান করা আরম্ভ করে।) তিনি বলেন, অতএব যিনি এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, সফরে রোযা রাখা উচিত নয় সেই তিনিই এ কথাও বলেছেন যে, কাদিয়ান আহমদীদের জন্য দ্বিতীয় মাতৃভূমি আর এখানে রোযা রাখা বৈধ। তাই এখানে রোযা রাখা তাঁর প্রদত্ত ফতোয়া অনুসারেই সঠিক, যদিও এর আরো কারণ রয়েছে।"

(আল-ফযল, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৩৪)

একস্থানে অবস্থান কালে রোযা সম্পর্কে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব বলেন, রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির এক জায়গায় তিন দিনের অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় তাহলে তার রোযা রাখা উচিত। তিন দিনের কম যদি থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়। আর কাদিয়ানে যদি স্বল্পকাল অবস্থান সত্ত্বেও কেউ রোযা রাখে তাহলে পরে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই।

(ফাতাওয়া হযরত সৈয়্যদ সারওয়ার শাহ সাহেব)

কেননা কাদিয়ান দ্বিতীয় মাতৃভূমি, এখানে তিন দিনের কমেও যদি কেউ রোযা রাখতে চায়, রাখতে পারে, কিন্তু অন্যস্থানে তিন দিন অবস্থান থাকলে রোযা রাখতে পারবে।

মুসাফির এবং রুগ্নরা যাতে রোযা না রাখে এ সম্পর্কে একটি ঘটনা রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি জানতে পারেন যে, লাহোর থেকে শেখ মোহাম্মদ চট্টু সাহেব নামে এক ব্যক্তি এসেছেন আর অন্যান্যরাও এসেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর মহান চারিত্রিক গুণবশতঃ বাইরে আসেন, উদ্দেশ্য ছিল তিনি ভ্রমণের জন্য বাইরেও যাবেন আর বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতেরও উপলক্ষ সৃষ্টি হবে। যারা বাইরে থেকে এসেছেন তাদের সাথেও সাক্ষাত হবে। অন্যরাও তা জানতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাইরে আসবেন। তাই অনেকেই ছোট মসজিদে অর্থাৎ মসজিদে মুবারকে সমবেত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দরজার বাইরে আসেন অন্য দিনের মত খোদ্দামরা পতঙ্গের ন্যায় তাঁর দিকে ছুটে যায়, তিনি শেখ সাহেবের দিকে তাকিয়ে মাসনূন সালামের পর বলেন, আপনি কেমন আছেন? তিনি পুরোনো পরিচিত মানুষ। বাবা চট্টু সাহেব বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাকীম মোহাম্মদ হোসেন কোরেশী সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন যে তাঁর যেন কোন কষ্ট না হয় এটি নিশ্চিত করা আপনার কর্তব্য। তাঁর থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করুন। যে জিনিষের প্রয়োজন হয় আমাকে জানান আর মিয়া নাজিমুদ্দিন সাহেবকে তাগাদা দিন যে, খাবারের জন্য যা যথোপযুক্ত এবং যা খাওয়া পছন্দ করেন তা যেন প্রস্তুত করেন। হাকীম সাহেব বলেন যে, ইনশাআল্লাহ্ কোন কষ্ট হবে না। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অতিথিকে সম্বোধন করে বলেন যে, আপনি নিশ্চয় রোযা রাখেন নি। সেই ব্যক্তি বলেন যে, আমি রোযা রেখেছি। তিনি আহমদী ছিলেন না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কুরআন যেসব বিষয়ে অব্যহতি প্রদান করেছে সেগুলোর উপর অনুশীলন করাও তাকওয়া। আল্লাহ্ তা'লা মুসাফির এবং রুগ্নদের অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি এবং ছাড় দিয়েছেন, তাই এই নির্দেশও মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, আমি পড়ে জেনেছি যে, উম্মতের অধিকাংশ বুযর্গদের মতামত হলো, যে ব্যক্তি অসুস্থ্য অবস্থায় এবং সফরে রোযা রাখে সে পাপ করে। কেননা আসল বিষয় হলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন, নিজের ইচ্ছার (আনুগত্য নয়) আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মধ্যে নিহিত অর্থাৎ তিনি যে নির্দেশ দেন তার আনুগত্য করা উচিত। নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন সংযোজন করা উচিত নয়। তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) এতে অন্য কোন শর্ত রাখেন নি যে, এমন সফর হতে হবে আর এ ধরণের অসুস্থতা হতে হবে। আমি সফরে রোযা রাখি না, অনুরূপভাবে অসুস্থ অবস্থায়ও রোযা রাখি না, আজও আমার শরীর ভাল নেই, তাই আমি রোযা রাখি নি। হাঁটা চলা করলে রোগের প্রকপ কিছুটা কমে যায়, তাই আমি বাইরে যাব। (মেহমানকে তিনি জিজ্ঞেস করেন) আপনিও যাবেন কি? বাবা চট্টু সাহেব বলেন যে, না আমি যেতে পারবো না, আপনি হয়ে আসুন। নিঃসন্দেহে এই নির্দেশ রয়েছে কিন্তু সফরে যদি কোন কষ্ট না হয় তাহলে রোযা কেন রাখা হবে না। হুযূর আকদস (আ.) বলেন যে, এটি আপনার মতামত, কুরআন শরীফে কষ্ট হওয়া বা কষ্ট না হওয়ার কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নি। আপনি একজন বয়োঃবৃদ্ধ এক ব্যক্তি। জীবনের কোন ভরসা নেই, মানুষের সেই পথই অবলম্বন করা উচিত যাতে খোদা তা'লা সন্তুষ্ট হন এবং যেন সিরাতে মুস্তাকীম পাওয়া যায়। তখন বাবা সাহেব বলেন, আমি তো এ জন্যই এসেছি যেন আপনার কাছে থেকে কিছুটা উপকৃত হতে পারি, যদি এই পথই সত্য হয় তাহলে কোথাও এমন যেন না হয় যে, আমরা ঔদাসিন্যের মাঝে মারা যাই। হুযূর বলেন যে, এটি খুবই ভাল কথা। তিনি বলেন, আমি কিছুটা ঘুরে আসি, আপনি বিশ্রাম করুন। "

(আল-হাকাম ৩১ জানুয়ারী, ১৯০৭)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে রুগ্ন এবং মুসাফির ব্যক্তির রোযা রাখার প্রসঙ্গ উঠে। হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব সেই পূর্বের কথায় বলেন যে,শেখ ইবনে আরাবীর উক্তি রয়েছে, রুগ্ন এবং মুসাফির যদি রোযার সময় রোযা রাখে তাহলে সুস্থ হওয়ার পর রমযানের পর তার জন্য পুনরায় রোযা রাখা আবশ্যক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ বা সফরে থাকে তারা রমযান মাসের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলেন নি যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির যদি নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে বা নিজের বাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে এই দিনগুলিতে রোযা রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ হলো, সে যেন পরবর্তীতে রোযা রাখে। পরবর্তীতেরোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক। মধ্যবর্তী রোযা যদি সে রাখে এটি তার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়, এটি তার নিজেরই বাসনা। এর ফলে পরে রোযা রাখা সম্পর্কিত খোদার নির্দেশে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি সফর এবং অসুস্থতার অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। নির্দেশ হলো রুগ্ন এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে, সুস্থ্য হওয়ার পর আর সফর সমাপ্তির পর সে রোযা রাখবে। আল্লাহ্র এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত, কেননা পরিত্রাণ লাভ হয় খোদার অনুগ্রহে, কর্মবলে কেউ মুক্তি পেতে পারে না।" তিনি বলেন, খোদা তা'লা এই কথা বলেন নি যে, রোগ সামান্য না বেশি, সফর সংক্ষিপ্ত নাকি দীর্ঘ, বরং এটি সার্বজনীন একটি নির্দেশ, এটি মেনে চলা উচিত। রুগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তারা নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হবে।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩০-৪৩১)

এক বর্ণনায় এসেছে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, মিঞাঁ রহমতুল্লাহ্ সাহেব পিতার নাম মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী, তিনি বর্ণনা করেন যে, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় আসেন। পবিত্র রমযান মাস ছিল। আমরা সবাই গৌসগড় থেকে রোযা রেখে লুধিয়ানা যাই। হুযূর আমার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন বা অন্য কারো কাছ থেকে জানতে পারেন যে, (এখন আমার মনে নেই) গৌসগড় থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই রোযাদার। হুযূর (আ.) বলেন, মিঞা আব্দুল্লাহ্! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন একইভাবে সফরে রোযা না রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা সবাই রোযা খুলে ফেলুন। যোহরের পরের কথা এটি। এরপর সবার রোযা খুলে দেওয়া হয়েছে।

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, পৃষ্ঠা-১২৫)

আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই লিখেন, মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন যে, "প্রাথমিক যুগের কথা, একবার রমযান মাসে এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কোন মেহমান আসে। তিনি রোযা রেখেছিলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছিল, খুব সম্ভব আসরের পরের কথা এটি। হুযূর তাকে বলেন যে, আপনি রোযা খুলে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলেন যে, সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, রোযা খুলে কি লাভ। হুযূর বলেন, আপনি কি জোর করে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চান? খোদা তা'লাকে জোর করে সন্তুষ্ট করা যায় না, বরং তাঁকে আনুগত্যের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, মুসাফির রোযা রাখবে না, সেখানে রোযা রাখা উচিত নয়। একথা শুনেসেই ব্যক্তি রোযা খুলে ফেলেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা-৯৭)

একইভাবে কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন যে, একবার আমি এবং হযরত মুন্সী আরোড়া খান সাহেব এবং হযরত খান সাহেব মোহাম্মদ খান সাহেব হুযূরের সকাশে উপস্থিত হই। রমযান মাস ছিল, আমার রোযা ছিল, আমার সাথীরা রোযা রাখেন নি। আমরা যখন হুযূরের কাছে উপস্থিত হলাম তখন সূর্য ডুবতে কিছু সময় বাকী ছিল, সূর্য ছিল ডুবতে চলেছিল। আমার সাথীরা বললেন যে, জাফর আহমদ রোযা রেখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তক্ষুনি ভিতরে যান এবং এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসেন আর বলেন যে, রোযা খুলে ফেল, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়। আমি নির্দেশ মান্য করি। আর পরে সেখানে অবস্থানের সুবাদে, (কিছু দিন সেখানে অবস্থান করার কথা ছিল) রোযা আরম্ভ করি। রোযার দিনগুলোতে সেখানে অবস্থানকালে এক দিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইফতারের সময় একটি থালায় তিনটি বড় শরবতের গ্লাস নিয়ে আসেন। আমরা রোযা খুলতে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম যে, হুযূর! মুন্সিজী আরোড়া খান সাহেবের এক গ্লাসে কিছু হয় না। (সারাদিন রোযা রেখেছেন, আর আপনি এক গ্লাস করে পানি এনেছেন, এতে তার কিইবা হবে) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুচকি হাসেন এবং দ্রুত ভিতরে গিয়ে একটি জগ ভর্তি করে শরবত নিয়ে আসেন আর মুন্সিজীকে পান করান। মুন্সিজী মনে করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে শরবত পান করছি, তাই তিনি পান করতে থাকেন এবং পুরো জগ পান করে ফেলেন। (আসহাবে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৪) একটা বড় জগ ভর্তি শরবত ছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পেনশনার মওলা বক্স সাহেব মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব মুবাশ্বেরের মারফত লিখে পাঠিয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রমযান মাসে অমৃতসর আসেন, সেখানে তাঁর লেকচার ছিল মুন্ডু বাবু ঘনিয়া লালে (যার বর্তমান বন্দেমাতারাম পাল)। সফরের কারণে হুযূরের রোযা ছিল না, বক্তৃতা চলাকালে মুফতি ফজলুর রহমান সাহেব হুযূরকে চায়ের পেয়ালা দেন, হুযূর এদিকে দৃষ্টি দেন নি, তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসেন, তখন হুযূর বক্তৃতায় ব্যস্ত ছিলেন, এরপর মুফতি সাহেব পেয়ালা তাঁর আরো কাছে নিয়ে আসেন, হুযূর তা থেকে নিয়ে চা পান করেন। তখন মানুষ হৈ চৈ আরম্ভ করে যে, এই হলো রমযান মাসের সম্মান, ইনি রোযা রাখেন না। এভাবে তারা বাজে কথা আরম্ভ করে দেয়। বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়, হুযূর পর্দার অন্তরালে চলে যান। গাড়ী অন্য দিক থেকে দরজার সামনে আনা হয়, হুযূর এতে প্রবেশ করেন। মানুষ ইট-পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা আরম্ভ করে এবং তুমুল গন্ডগোল বেধে যায়। গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু হুযূর নিরাপদে তাঁর অবস্থানস্থলে পৌঁছে যান। একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, পরে শোনা গেছে যে, এক গয়ের আহমদী মৌলভী বলছিল যে, আজকে মানুষ মির্যাকে নবী বানিয়ে দিয়েছে, আমি স্বয়ং তাঁর মুখে এটি শুনিনি। এরপর হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে আমরা বাইরে যাই। আমি তাঁকে বললাম যে, মানুষ ইট-পাথর মারছে, হৈ-হুল্লোড় হচ্ছে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। তখন খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন যে, মানুষ যাকে পাথর মারত তিনি চলে গেছেন, আমাকে কে পাথর মারবে। যেহেতু মুফতি ফযলুর রহমান সাহেবের চা পরিবেশনের কারণে এই হৈচৈ এবং গণ্ডগোল হয়, তাই সবাই তাকে বলা আরম্ভ করে যে, তুমি কেন এমনটি করলে, সব আহমদী তার পিছনে লেগে যায়। এবং সমস্ত ঘটনার জন্য তাকেই দোষারোপ করতে থাকে। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন যে, আমিও তাকে এমনই বললাম, তিনি পরে বিরক্ত হয়ে যান। মিঞাঁ আব্দুল খালেক মরহুম পরে আমাকে বলেন, এই বিষয়টি যখন হুযূরের সামনে উপস্থাপন করা হয় যে, মুফতি সাহেব অনর্থক বক্তৃতা নষ্ট করেছেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মুফতি সাহেব কোন মন্দ কাজ করেন নি। এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশ যে, সফরে রোযা রাখবে না । আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই কাজের মাধ্যমে এই নির্দেশের প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। (এটি ছিল হযরত মসীহ মওউদ-এর উত্তর। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উত্তর শুনে মুফতি সাহেবের সাহস আরো বেড়ে যায়।)

((সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা-১৪৭)

অসুস্থ্য হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রক্তচাপ কমে যায় আর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে। তখন সূর্য ডুবন্ত প্রায় ছিল,কিন্তু তিনি তক্ষুনি রোযা খুলে ফেলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, এই অধম বর্ণনা করছে যে, হাদীসে হযরত আয়েশার (রা.) রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) সম্পর্কে এটিই দেখা যায় যে, তিনি সব সময় দু'টো বৈধ পথের মাঝে সহজ পথকে প্রাধান্য দিতেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা-৬৩৭)

একবার প্রশ্ন করা হয় যে, অনেক সময় রমযান মাস এমন ঋতুতে আসে যখন কৃষকদের কাজ অনেক বেশি থাকে, যেমন ফসল রোপন বা কাটার ঋতু হয়ে থাকে। যারা শ্রমজীবী এমন শ্রমিকদের জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয় না, এ সম্পর্কে শিক্ষা কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, 'আল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত' এরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। তাকওয়া এবং পবিত্রতার নিরিখে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অবস্থা যাচাই করা উচিত। কেউ যদি মজদুরী করা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে তাহলে তার রাখা উচিত নতুবা সে অসুস্থদের মধ্যে গন্য হবে, এরপর যখন সুযোগ হয় রাখতে পারে। (বিশেষ করে গরমের দিনগুলো অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে আর এই সব দেশে তাপমাত্রা অনেক বেশি হয়ে থাকে, ভয়াবহ হয়ে থাকে, সেই সব দেশ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, এই মজদুরীর কারণে তারা পরে রাখতে পারে।) আর وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হলো যাদের শক্তি নেই বা সামর্থ্য নেই।" (মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯৪)

রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় তাদের জন্য কি আদেশ রয়েছে? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একবার আমার হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে, তখন বুঝতে পারলাম যে, তৌফিক এবং সামর্থ্য লাভের জন্য, যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই মানুষকে সামর্থ্য দিয়ে থাকে। সব কিছু খোদার কাছেই যাচনা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সর্ব শক্তিমান, তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রুগীকেও রোযার সামর্থ্য দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্য এটিই, যেন সামর্থ্য লাভ হয়। এটি খোদার বিশেষ অনুগ্রহে হয়ে থাকে। তাই আমার মতে এই দোয়া করা কতই না উত্তম বিষয় যে, হে আল্লাহ্! এটি তোমার এক পবিত্র মাস, আর আমি এই মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, আমি জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কি না বা এই ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রাখতে পারব কি না। আর সে যদি আল্লাহ্র কাছে সামর্থ্য যাচনা করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার সামর্থ্য দান করবেন।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৮-২৫৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, "ফিদিয়া দিলেই রোযা মাফ হয়ে যায় না বরং ফিদিয়া এই কারণে দেওয়া হচ্ছে যে, এই বরকতময় দিনগুলোতে শরীয়তের কোন বৈধ কারণে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে একত্রে রোযা রাখতে পারে না। এই যে ছাড়, এটি দু'ধরণের হয়ে থাকে, একটি সাময়িক, আরেকটি স্থায়ী। ফিদিয়া সাধ্যানুসারে উভয় অবস্থায় দেওয়া উচিত। এক কথায় কেউ ফিদিয়া দিলেও এক বছর, দুই বছর বা তিন বছর পর যখনই তার স্বাস্থ্য অনুমতি দেয়, তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পূর্বের রোগ সাময়িক ছিল আর স্বাস্থ্য লাভের পর তার রোযা রাখার সিদ্ধান্ত করার মাঝেই যদি পুনরায় সে স্থায়ীভাবে অসুস্থ্য হয়ে যায় তাহলে সে ফিদিয়া দেবে। বাকী যে খাবার খাওয়ানোর সামার্থ্য রাখে সে যদি অসুস্থ্য হয়, মুসাফির হয় তাহলে তার জন্য আবশ্যক হবে রমযান মাসে একজন মিসকিনকে ফিদিয়া স্বরূপ খাবার খাওয়ানো এবং বছরের অন্য সময় সে রোযা রাখবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি এটিই ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব সময় ফিদিয়াও দিতেন পরে আবার রোযাও রাখতেন আর অন্যদেরকেও এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশই দিতেন।" (তাফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না বা যে সক্ষম নয় তার এর বিনিময়ে মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হয়। এ খাতে যা ব্যয় হয় তা এতিম তহবিলে দেওয়া

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 7th July, 2016 Issue No. 18

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

বৈধ কি না? (জামাতের ব্যবস্থাপনার হাতে সেই পয়সা দেওয়া বৈধ কি না?) হুযূর বলেন, একই কথা, শহরে মিসকীনকেও খাওয়াতে পারে বা এতিম ও মিসীকন ফান্ডেও দিতে পারে।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭১)

কোন পরিচিত ব্যক্তির যদি রোযা খোলাতে হয় বা ইফতার করাতে হয় তাহলে তাও করানো যেতে পারে।

অজান্তে খেলে বা পান করলে রোযা ভেঙ্গে যায় না। এই বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সামনে একটি চিঠি উপস্থাপন করা হয় যে, রমযান মাসে সেহরীর সময় অমনোযোগী হয়ে ভিতরে বসে খাওয়া অব্যাহত রাখি আর বাইরে বেরিয়ে দেখি যে, শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। আমার জন্য সেই রোযা পরে রাখা আবশ্যক কি না? (তিনি দীর্ঘক্ষণ সেহরী খেতে থাকেন। এমতাবস্থায় ভোরের শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিল) উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, অজান্তে খেলে বা পান করলে সেই রোযার স্থলে দ্বিতীয় রোযা রাখা আবশ্যক নয়।"(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৬) ভুলবশতঃ খেলে কোন অসুবিধা নেই।

বয়স প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় যে, কোন্ বয়সে রোযা রাখা উচিত? অনেক বাচ্চারাও জিজ্ঞেস করে আর বয়স্করাও জিজ্ঞেস করে। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়ত কম বয়স্কদের রোযা রাখতে নিষেধ করেছে কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে কিছু রোযা রাখার অভ্যাস অবশ্যই করানো উচিত। তিনি বলেন, আমার যতটা মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ১২ বা ১৩ বছর বয়সে প্রথম রোযার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি ৬/৭ বছরের শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করে আর মনে করে যে, আমরা পুণ্যের ভাগী হব। এটি পুণ্য নয় বরং এটি একটি অন্যায়। কেননা এটি দৈহিক উন্নতি ও বিকাশের বয়স। অবশ্য যৌবনে পদার্পনের নিকটবর্তী সময়ে, যখন রোযা আবশ্যক হওয়ার দিন সন্নিকটে থাকে তখন রোযার চর্চা অবশ্যই করানো উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতিকে যদি দেখা হয় তাহলে ১২/১৩ বছর বয়সে কিছু অভ্যাস করানো উচিত এবং প্রত্যেক বছর কয়েকটি রোযা রাখানো উচিত যতদিন না বয়স ১৮ হয়, যা আমার মতে রোযার জন্য পূর্ণ বয়স। প্রথম বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শুধু একটি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছিলেন, (অর্থাৎ ১২/১৩ বছর বয়সে হুযূর শুধু ১টি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন।) এ বয়সে শুধু রোযার একটা আগ্রহ থাকে, সেই আগ্রহের কারণে বাচ্চারা বেশি রোযা রাখতে চায়, তখন পিতা-মাতার উচিত তাদের নিষেধ করা। এরপর বয়সের এক পর্যায়ে বাচ্চাদের সাহস যোগানো উচিত যে, অবশ্যই কয়েকটি হলেও রোযা রাখা উচিত। (কিন্তু শৈশবে বারণ করা উচিত, বেশি রোযা রাখতে দেওয়া উচিত নয়। আর যখন যৌবনে পদার্পন করে তখন উৎসাহিত করা উচিত) একই সাথে দেখা উচিত যে, বেশি রোযা যেন না রাখে। আর যারা দেখে তাদের আপত্তি করা উচিত নয় যে, সব রোযা কেন রাখে না। কেননা কিশোর কিশোরীরা যদি এই বয়সে সব রোযা রাখে তাহলে পরে আর রাখতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন কোন ছেলে মেয়ে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে, আমি দেখেছি অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের সাক্ষাতের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে, আর বলে যে, এর বয়স ১৫ বছর অথচ দেখতে মনে হয় ৭/৮ বছর বয়স্ক। (আমার কাছেও এমন অনেকেই আসে।) তিনি বলেন, আমি মনে করি এমন ছেলে মেয়ে ২১ বছর বয়সে রোযার জন্য সাবালক হিসেবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে একটি হৃষ্টপুষ্ট বালক হয়ত ১৫ বছর বয়সেই ১৮ বছর মনে হয়, কিন্তু যদি আমার এই শব্দগুলো ধরে বসে যায় যে, রোযার জন্য সাবালক হওয়ার বয়স হলো ১৮ তাহলে সে আমার ওপরও জুলুম করবে না আর খোদার বিরুদ্ধেও অন্যায় করবে না, বরং নিজ প্রাণের ওপর নিজেই অন্যায় করবে। অনুরূপভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা যদি রোযা না রাখে আর মানুষ তার সমালোচনা করে তাহলে এমন সমালোচনাকারী নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করবে।"

(তাফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৫)

হযরত নওয়াব মোবারাকা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জৈষ্ঠ্যা কন্যা ছিলেন, তিনি বলেন, যৌবনে পদার্পনের পূর্বে স্বল্প বয়সে তিনি (আ.) রোযা রাখানো পছন্দ করতেন না, দু'একটি রাখাকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। হযরত আম্মা জান প্রথম রোযা রাখানোর পর মানুষকে ইফতারির দাওয়াত দিয়েছেন, জামাতের সব মহিলাদের ডেকেছেন। এই রমযানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমযানে আমি আবার রোযা রাখি, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলি যে, আজকে আমি আবার রোযা রেখেছি। তিনি কক্ষেই ছিলেন, পাশের টুলে দু'টো পান ছিল, খুব সম্ভব হযরত আম্মাজান বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি পান হাতে নিয়ে আমাকে বলেন, নাও এই পান খাও, তুমি দুর্বল, রোযা রাখবে না, রোযা ভেঙ্গে ফেল। আমি পান খেয়ে ফেলি, একই সাথে বলি যে, সালেহাও (অর্থাৎ ছোট মামার স্ত্রী) রোযা রেখেছেন। তিনিও স্বল্প বয়স্কাই ছিলেন, তার রোযাও ভাঙ্গিয়ে দিন। মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, তাকেও ডাক। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি আসলে মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দ্বিতীয় পান ধরিয়ে দেন আর বলেন যে খাও, তোমার রোযা নেই। আমার বয়স হয়ত তখন ১০ বছর হবে।

(তাহরীরাত মুবারাকা , ফিকহুল মসীহ, পৃষ্ঠা-২১৪)

অনুরূপভাবে তারাবী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। গোলেকীর আকমল সাহেব লিখিতভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রমযান শরীফে রাতে উঠা এবং নামায পড়ার তাকিদ রয়েছে, কিন্তু সচরাচর পরিশ্রমী মজদুর ও কৃষকরা এমন কাজের ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদেরকে রাতের প্রথম অংশে যদি তারাবীহ-র পরিবর্তে ১১ রাকাত নামায রাতের শেষাংশে পড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে কি না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, কোন অসুবিধা নেই, তাদের পড়ে নেওয়া উচিত।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫)

তারাবী সম্পর্কে নিবেদন করা হয় যে, এটি যেহেতু তাহাজ্জুদ তাই ২০ রাকাত পড়া সম্পর্কে হুযূরের নির্দেশ কি? কেননা তাহাজ্জুদ তো বিতরসহ ১১ বা ১৩ রাকাত। তিনি বলেন যে, রসূল করীম (সা.)-এর স্থায়ী রীতি হলো ৮ রাকাত পড়ার, তিনি তাহাজ্জুদের সময়ই তা পড়তেন আর এটিই উত্তম। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়াও বৈধ। (তাহাজ্জুদের সময় উঠে ৮ রাকাত পড়াই যথোচিত, কিন্তু রাতের প্রথম অংশে পড়লেও তা বৈধ, অর্থাৎ ঘুমানোর পূর্বে) আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এটি পড়েছেন। ২০ রাকাত পরে পড়া হয়েছে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতি তাই ছিল যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৩)

২০ রাকাত বা বেশি রাকাত সংক্রান্ত কথাগুলো পরের। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি হলো ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়া।

এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে একটি পত্র লিখে যার সারাংশ হলো, সফরে কিভাবে নামায পড়তে হয় আর তারাবীহ সম্পর্কে কি নির্দেশ? তিনি বলেন, সফরে দু'রাকাত নামায পড়াই সুন্নত, আর তারাবীও সুন্নত তাই তাও পড়ুন, ঘরে একাও পড়তে পারেন , কেননা তারাবী আসলে তাহাজ্জুদ, নতুন কোন নামায নয়। আর বিতর যেভাবে পড়ছ সেভাবেই পড়।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২)

অতএব, রমযান সংক্রান্ত এই কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে রমযানের রোযা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

হাদীস

"রমযান ও কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে খোদা, আমি তাকে পানাহার এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছি তাই তুমি তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করো। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি এবং তাকে ঘুমাতে দিই নি এ কারণে তার জন্য আমার সুপারিশ কবুল করো। তাদের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে।"

(বাইহাকী)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir